বাংলার মহিলা চিত্রশিল্পীদের কথা

ঈশিতা সেনগুপ্ত

বাংলার আকাশে বাতাসে বোধহয় একধরণের সুর ভেসে বেড়ায়, ছবি আঁকে মানুষের মনে। সেই সুরে কুমোর কলসি গড়ে তার গায়ে ফুল-পাতা এঁকে দেয়, ছুতোর পালঙ্কের গায়ে নক্সা আঁকে। তাদের শিল্পচেতনা রসিকজনের নজর কাড়ে। কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনীরা – তাদের মনের দোরেও কি সুন্দর এসে কড়া নাড়ে না? তারা সুন্দরের আরাধনা করে নকসিকাঁথা বুনে, সন্দেশের ছাঁচ তুলে, গয়নাবড়ি বানিয়ে।

সাহেবদের হাত ধরে ব্রিটিশ ভারত দেখে বেশ কিছু চিত্রপ্রদর্শনী, চিত্র শিক্ষালয়। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তৈরী হয় কুমোর-ছুতোর-পটুয়ার থেকে উন্নততর এক শিল্পী সমাজ – যার মন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা আরো কিছু নারীকে পাই যাঁরা নিজেদের আরো একটু প্রসারিত করতে পেরেছিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে ১৮৭৯ সালের কলকাতা প্রথম দেখেছিল ২৫ জন মহিলাশিল্পীদের এক চিত্রপ্রদর্শনী। তারও প্রায় ৫০ বছর পর ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল তার দরজা খুলেছিল ছাত্রীদের জন্য।

হারান চন্দ্র মিত্রের কন্যা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮ - ১৯২৪)চিত্রচর্চা নজর কাড়ে লর্ড মিন্টোর পত্নীর। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর ছবি স্থান পায় সুদূর অস্ট্রেলিয়ার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে। সেকালের ‘ভারতী’, ‘মানসী’ ও ‘মর্মবাণী’

পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। গগন ও অবন ঠাকুরের বোন সুনয়নী দেবী (১৮৭৪ - ১৯৫৭) তাঁর দাদাদের মতোই চিত্রচর্চায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। নানান দেবদেবীর পাশাপাশি তাঁর তুলিতে উঠে আসে বাংলার আটপৌরে নারী ও তাদের ঘরকন্নার ছবি। খানিকটা পটচিত্রের আঙ্গিকে আঁকা তাঁর ছবিতে আমরা পাই এক সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা। তাঁর জীবদ্দশায় ভারতে যদিও কোনও প্রদর্শনী হয়নি, কিন্তু ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট কিন্তু ইউরোপে তাঁর বেশ কিছু প্রদর্শনী আয়োজন করেছিল। নবাব স্যার খাজা আহসানউল্লার কন্যা মেহেরবানু খানম-এর (১৮৮৫ - ১৯২৫)ছবি দেখে নজরুল ইসলাম এতটাই মুগ্ধ হন যে তার অনুপ্রেরণায় ‘খেয়াপারের তরণী’ নামে একটি কবিতা লেখেন। সেই সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা ‘মোসলেম ভারত’-এ তাঁর ছবি ছাপা হত। উপেন্দ্রকিশোরের কাছেই ছবি আঁকার হাতেখড়ি তাঁর কন্যা বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক সুখলতা রাও-এর (১৮৮৬ - ১৯৬৯)। সেই সময় ‘প্রবাসী’, ‘মডার্ণ রিভিউ’, ‘সুপ্রভাত’, ‘সন্দেশ’ ইত্যাদি পত্রিকায় পাঠক প্রায়ই তাঁর ছবি দেখতে পেতেন। মূলতঃ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকেই তিনি ছবির রসদ সংগ্রহ করতেন।

বাংলা আকাদেমী প্রণীত ‘চরিতাভিধানে’ হাসিনা খানমকে (১৮৯২ -?) প্রথম মুসলিম মহিলাশিল্পী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর কিছু জলরঙ ও খসড়া ছবি প্রকাশিত হয় ‘শওগত’, ‘বসুমতী’ ইত্যাদি পত্রিকায়।

গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের ভাগ্নী প্রতিমা দেবীর (১৮৯৩ - ১৯৬৯)শিল্পপ্রেম বোধহয় রক্তেই ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রায় নন্দলাল বসুর কাছে প্রতিমা দেবীর শিক্ষালাভ তাঁর ছবিকে আরো পরিপূর্ণতা দান করে। ফ্রেস্কো, সেরামিক্স, বাটিক শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ১৯৩৫-এ লণ্ডনে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। সে যুগে এক বাঙালী নারীর জীবনে এ এক অসামান্য কৃতিত্ব। কিন্তু তাঁকে আমরা স্বাধীন শিল্পী হিসাবে যত না পাই, রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মী হিসেবেই যেন বেশী করে পাই। বিখ্যাত সাময়িকপত্র ‘প্রবাসী’, ‘মডার্ণ রিভিউ’ ইত্যাদির সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তাদেবীও (১৮৯৩ - ১৯৮৪) শৈশব থেকেই এক শৈল্পিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠেন। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের বিশেষ প্রিয় এই শিল্পীর ছবি কলকাতা, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুনে প্রদর্শিত হয়। রংতুলির পাশাপাশি কাঁথাশিল্পেও তিনি ছিলেন সিদ্ধা।

শিল্পী শচীশচন্দ্রের স্ত্রী ইন্দুরানী সিন্হার (১৯০৫ - ?) চিত্রচর্চা শুরু স্বামীরই হাত ধরে। তেলরং, জলরং, প্যাস্টেল – সবেতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্তা। নিসর্গ চিত্রের পাশাপাশি তাঁর হাতে আমরা ন্যুড স্টাডিও দেখতে পাই। সেই সময়কার মহিলাশিল্পী হিসাবে তা ছিল যথেষ্টই ব্যতিক্রমী ও সাহসী পদক্ষেপ। তিনি শুধু নিজেই ছবি এঁকে সন্তুষ্ট ছিলেন না ১৯৪১-এ মহিলাদের জন্য একটি আর্ট স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দলাল কন্যা গৌরী ভঞ্জ (১৯০৭ - ?) তাঁর শিল্পশিক্ষা শুরু করেন

শান্তিনিকেতনেই। সুকুমারী দেবী অসুস্থ হলে গৌরীদেবীই কারুশিল্পের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। তাঁরই হাত ধরে বাটিক শিল্প শান্তিনিকেতনে প্রসারিত হয়।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্ত্রী ইন্দিরা দেবী (১৯১০ - ১৯৫০) বিয়ের পর ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শুরু করেন চিত্রচর্চা। পরবর্তীতে বিখ্যাত প্রতিকৃতি শিল্পী অতুল বসুর কাছে তাঁর প্রতিকৃতিচর্চার পাঠগ্রহণ। আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের একাদশতম বার্ষিক প্রদর্শনীতে মহিলা বিভাগে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন।

সাধারণ ঘরের মহিলাদের উন্নতি ও তাদের মনে শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলার তাগিদে ইন্দুসুধা ঘোষ মহিলা শিল্প শিক্ষালয় ও নারী সেবা সংঘে নিজেকে নিয়োজিত করে এক সামাজিক চেতনার বীজ বুনে দিয়ে যান।

অবনীন্দ্রনাথ স্নেহধন্যা এক বিখ্যাত শিল্পী হাসিরাশি দেবী। একমাত্র কন্যার মৃত্যুশোক বারবার তাঁর ছবিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। পাশাপাশি তিনি হাসির গল্প লিখতেন ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। অনেকটা ঠিক যেন তাঁর গুরুরই মতো তুলি ও কলম দুটোতেই তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'বিচিত্রা' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়েছিল।

বিখ্যাত শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে-র বোন অবনীন্দ্রনাথ স্নেহধন্যা রানী চন্দ (১৯১২ - ?) কলাভবনে আসেন ১৯২৮-এ। সেইসময় নন্দলাল ও অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয় তাঁর। জলরং, টেম্পেরা, ক্রেয়ন, চক, উডকাট, লিনোকাট ইত্যাদি মাধ্যমে তিনি শিল্পচর্চা করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। শান্তিনিকেতনের আর এক ছাত্রী চিত্রনিভা চৌধুরী ১৯১৩ সালে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। চোদ্দ বছর বয়সে নোয়াখালির নিরঞ্জন চৌধুরীর সাথে বিবাহের পর তাঁরই উৎসাহে কলাভবনে

নন্দলাল বসুর কাছে তাঁর শিল্পশিক্ষা। তারপর একবছর সেখানেই তিনি শিক্ষকতা করেন। জলরঙে আঁকা তাঁর ছবিতে ভারতীয় সাহিত্য, গ্রামবাংলার সমাজ জীবন ও দেশীয় মানুষ বারবার রূপ পেয়েছে।

A River in full Moon, Water Colour

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মহিলা শিল্পীরা এভাবেই কন্যা-জায়া-জননীর চিরাচরিত ভূমিকার পাশাপাশি নিজেদের এক শৈল্পিক স্বকীয়তা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদেরই পথ বেয়ে আজ আমরা পেয়েছি শানু লাহিড়ী, রেবা হোর, ইলিনা বণিক, শাকিলাদের যাঁরা আজ চিত্রপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত গর্বের নাম।

- *প্রথম ছবিটি সুনয়নী দেবীর আঁকা। দ্বিতীয়টি আঁকা প্রতিমা দেবীর। আর তৃতীয় ছবিটির শিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরী।*